বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার
মুখপত্র
প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংকলন
মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭৮
দাম : ৫০ পয়সা

● বিদেশ থেকে কারিগরি আমদানি : একটি সমীক্ষা—২
● স্বাধীন ভারতবর্ষে ঔষধশিল্প ও তার সমস্যা—৯
● সংবাদ—১৪
● চিঠিপত্র/মতামত—১৫

Editor's Note

['বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' গত সংখ্যা থেকে দ্বিভাষিকরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের প্রয়োজন অনুযায়ী বর্তমানে বাংলা ভাষার ওপরই আমরা বেশী জোর দেবো, কিন্তু তার সঙ্গে বিভিন্ন ভাষাভাষী অবাঙালী পাঠকদের জন্য ইংরাজিতেও কিছু কিছু লেখা থাকবে। এ সংখ্যায় পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে ইংরাজিতে সম্পাদকীয় পেশ করা হলো।]

This is the fifth issue of 'Vigyan-O-Vigyankarmi' which is now appearing as a bilingual (Bengali and English) magazine. This magazine is the mouthpiece of the Scientific Workers' Forum, West Bengal, which has been functioning, mainly in and around Calcutta, for the last few years. The principal aim of the Scientific Workers' Forum is to participate in generating a healthy and relevant movement of the scientific workers of our country for integrating science with the mainstream of social life. For this purpose, the obstacles in the path of proper use of science in our society are to be identified, and concerted efforts are to be applied in a realistic manner, together with other sections of the society, to remove these obstacles. This magazine is intended to serve as a platform where diverse opinions catering to this end are expressed, assessed, and integrated into a unified scientific outlook for the movement. It is hoped that various issues relevant in this context will be taken up by the scientific workers' community with a sincere aspiration towards concerted action. To be sure, it is not a new programme, but is a continuation of past efforts taken up with similar aims. The only new dimension that can be expected with the passage of time is an urge to understand our problems at a new level of depth, to divest our efforts of superficial criticism and counter-criticism, and to face seriously the task of formulating a concrete programme of action. The Association of Scientific Workers of India is the central organisation of the scientific workers in our country and publishes its organ regularly. The Scientific Workers' Forum is affiliated with the Association and this magazine is intended to serve a role complementary to the Bulletin of the Association of Scientific Workers of India. It will gladly collaborate with other local or national magazines having similar purpose.

The lead article in the present issue of 'Vigyan-O-Vigyankarmi' is on Transfer of Technology and how it impedes the growth of indigenous science. This issue is now being discussed and debated widely, specially in developing countries like India where there is a growing awareness of external domination in economic, social and cultural life. The accompanying article on Drug Industry in India is intended to serve as a concrete example of how the domination of external monopoly interests can cripple a vital sector where science can really serve the people of the country. These two articles are being published in Bengali because there does exist currently a considerable, though not adequate, amount of literature on these two topics in English. The present articles are to be taken as the beginning of a discussion. Further articles / notes on these issues are expected from fellow scientific workers.

বিদেশ থেকে কারিগরি আমদানি ঃ একটি সমীক্ষা

[**Import of technology from abroad : a survey**—The processes by which foreign technology has penetrated deep into our industry are examined. It is found that severe constraints prevent that fundamental mastery over the imported technology which can lead to its proper assimilation. The import of technology is further observed to inhibit local R & D and to act as a powerful obstacle to the development of indigeneous technology. The consequent danger of a permanent dependence is highlighted. The nature of the technology that has been imported, its suitability and quality, are discussed. Imports from the West and from Eastern Europe are distinguished. The examples of Japan and China are considered and self-reliance stressed as a viable policy alternative to import of technology.]

ভারতীয় শিল্পে যে কারিগরি ব্যবহার হয় তার প্রায় সবটাই বিদেশ থেকে আমদানী। ১৯৬১-৬২তে শিল্পে উৎপাদনের মূল্যের শতকরা মাত্র ১/২০ ভাগের ভিত্তি ছিল দেশজ জ্ঞান। এই ভাগ বেড়ে ১৯৬৭-৬৮তে দাঁড়ায় ১/১১ ভাগে, কিন্তু ১৯৬৯-৭০-এ আর বাড়ে না।[১] ভারতীয় শিল্প যদি মানবজ্ঞানের বর্ধমান ভাণ্ডার থেকে ভারতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা মারফৎ সরাসরি কারিগরি আমদানিতে সমর্থ হত, তাহলে বলার কিছুই থাকতো না। কিন্তু ভারতীয় শিল্পে এই আমদানি ঘটেছে অন্যভাবে। পুঁজি-যন্ত্র-মালমসলা-কারিগরি-দক্ষতা সব এসেছে এক মোড়কে সীলমোহর হয়ে। এর চরম উদাহরণ বোতামটেপা প্রকল্প (turnkey project), যেখানে নকশা থেকে চালু হওয়ার পর্যায় পর্যন্ত কারখানা থাকে বিদেশী তত্ত্বাবধানে। মোড়কমোড়া সাহায্যের মোহর ভেঙে কারিগরিটুকু আলাদা করে হজম ও প্রয়োগের সম্ভাবনা কমই থাকে। মোড়কে কারিগরির আমদানি চলেছে (১) বিদেশী কোং'র শাখা (২) দেশী ও বিদেশী কোং'র যৌথ উদ্যোগ (৩) বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহযোগে চালু দেশী (বিশেষতঃ সরকারী) উদ্যোগ মারফৎ। ১৯৬৮ পর্যন্ত তালিকাভুক্ত ২১৯২টি যৌথ উদ্যোগের প্রস্তাবের মধ্যে কেবল ১৫টিতে কারিগরি আমদানির স্পষ্ট উল্লেখ নেই।[২]

ইতিহাস ঃ ১৯৪৭ সালের আগে ও পরে সব সময়েই বিদেশী কারিগরির দাপট চলেছে। তবে বিদেশী পুঁজি ও কারিগরির বর্তমান আমদানির প্রবাহ শুরু হয় ১৯৫৬-৫৭ সাল নাগাদ, বিভিন্ন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণের বশে।[৩] ১৯৪৭ এর আগে জি. ডি. বিড়লার সিংহনাদ 'সমস্ত বৃটিশ পুঁজি ফেরৎ যাবে', বা মার্কিন পুঁজির খোঁজে টাটার সঙ্গে বিদেশ সফরের পরে তাঁর ঘোষণা 'আমরা তাদের স্পষ্ট জানিয়েছি যে কোনও অবস্থাতেই ভারত অভারতীয়দের নূতন শিল্পগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে না', ১৯৫৬ সালে এসে পরিণত হয় বিনীত হুঙ্কা-হুয়াতে : 'বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টানোর সময় এসেছে।.....বিদেশী বিনিয়োগকে কেবল অবাধ করলেই চলবে না, তাকে স্বাগত জানাতে হবে, তার জন্য আবহাওয়ার উন্নতি ঘটাতে হবে, ও পৃথিবীর যে কোনও জায়গার থেকে আমাদের দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করলে বেশী লাভ হবে এই ধারণা বিদেশী পুঁজিপতিদের মনে গেঁথে দিতে হবে।' দেশ ও বিদেশের চাপে সরকার বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের উপর থেকে বাধানিয়ন্ত্রণ অনেকটাই তুলে নেয়। এই সময় থেকে হু হু করে বিদেশী পুঁজি ঢুকতে থাকে এবং এর সঙ্গে যুক্ত থাকে কারিগরির আমদানি। কারিগরি আমদানির প্রতিদান বিক্রির উপর রয়ালটি (royalty) বা থোক পারিশ্রমিক ফী (fee) ছাড়া মালিকানার অংশ (শেয়ার) ধরে দেওয়ার অনুমতিও সরকার দিয়ে দেয়। কারিগরি আমদানি ও পুঁজি বিনিয়োগের সম্পর্ক এমনই দাঁড়ায় যে, বলা চলে পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ দাঁড়ায় কারিগরি আনার জন্য বিদেশী সরবরাহকারীর এক পুরস্কার। পশ্চিমী বেসরকারী পুঁজির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের সংখ্যা বাড়তে থাকে লাফ দিয়ে :[২]

সাল	বিদেশী সহযোগে যৌথ উদ্যোগের সংখ্যা
১৯৪৬-৫০	৪
১৯৫১-৫৮	৫৪২
১৯৫৯-৬৭	২২৪৬

প্রায় একই সময় থেকে শুরু হয় সোভিয়েত সংঘ ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে মোড়কে কারিগরির আমদানি। ১৯৭১ পর্যন্ত শিল্প ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগের অর্ধেকেরও বেশী এসেছিল সোভিয়েত সাহায্য হিসাবে।[৪] অবশ্য বেসরকারী পুঁজিপতিরা এই সাহায্যে বঞ্চিত

হয়নি। বিড়লার হিন্দুস্থান গ্যাস একেবারে প্রথম দিকেই সোভিয়েত কারিগরী সাহায্য পায়।[৩] ১৯৬৪ সালের মধ্যেই পূর্ব ইয়োরোপীয়রা ভারতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে ৭০টি যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলে।[৫] অন্যদিকে পশ্চিমী দেশগুলিও ভারতের সরকারী উদ্যোগগুলিতে যথেষ্ট পুঁজি ও কারিগরির আমদানি ঘটিয়েছে। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ১৪০০ কোটি টাকার পুঁজি খাটিয়ে ২৪টি বড় বড় সরকারী কোং ৯৭টি কারিগরি আমদানির চুক্তি করে। ১৯৫৫ সালের আগে এই ধরণের চুক্তির সংখ্যা ছিল মাত্র ৮। ৯৭টির মধ্যে ৭০টিকে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, ১৬টি চুক্তি বৃটিশদের সঙ্গে, ১৪টি মার্কিনদের সঙ্গে ও ১০টি পূর্ব ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে।[৩]

যৌথ উদ্যোগ মারফৎ কারিগরি আমদানির ঝোঁক এখনও প্রবল[৭]।

সাল	যৌথ উদ্যোগের সংখ্যা	পুঁজি (কোটি টাকা)
১৯৭৪	৩৫৯	৬·৭১
১৯৭৫	২৭১	৩·২১
১৯৭৬	২৮১	৭·২৭

সম্প্রতি ৫৫টি বৃহৎ আন্তর্জাতিক শিল্পসংস্থার ৯০ জন প্রতিনিধির একটি দলকে প্রধানমন্ত্রী বলেন: "....তাঁরা আমাদের দেশে সর্বত্র স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন এদেশে সরকারী অথবা বেসরকারী কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাঁরা যৌথ উদ্যোগ বা কারিগরী আমদানি ঘটাতে চান। সরকার তাঁদের এ ব্যাপারে কোনও বাধা দেবেন না।"

আমদানী কারিগরিই শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করছে: যৌথ উদ্যোগগুলির গুরুত্ব কতটা? ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে চালু সমস্ত নূতন বেসরকারী লগ্নির ৫৬% ছিল বিদেশী সহযোগপ্রাপ্ত যৌথ উদ্যোগগুলির। এই সময়কালে বৈদ্যুতিক ও যানবাহন বাদে অন্যান্য মেশিন তৈরীর ক্ষেত্রে অনুমোদিত নূতন বেসরকারী লগ্নির ৮২%, ভেষজ ও সুগন্ধির ক্ষেত্রে ৮২%, মৌলিক রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে ৮০%, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ৬২%, ও যানবাহনের যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ৭৫% ছিল ঐ যৌথ উদ্যোগগুলির।[৮] অন্যদিকে বিদেশী কারিগরির ভিত্তিতে তৈরী বৃহৎ সরকারী উদ্যোগগুলি ইস্পাত, মাটির তেল ও অন্য খনিজ পদার্থ, ভারী মেশিন ও যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক শক্তি ও যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক ও ভেষজ শিল্পক্ষেত্রে এক একটি দানববিশেষ। যন্ত্রপাতি ও খুচরো পার্টস্ সরবরাহ ও সারাই, কারিগরির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছেড়ে দিলেও মূল কারিগরির ব্যাপারেই এই উদ্যোগগুলি বিদেশী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে পারে নি। সরকারী উদ্যোগগুলির ভূমিকা ও অবদান পরীক্ষা করতে গিয়ে পঞ্চম লোকসভার এক কমিটি সরকারী ইঞ্জিনীয়ারিং বিশেষজ্ঞ কোং ইঞ্জিনীয়ার্স্ ইণ্ডিয়ার সমালোচনায় বলেন যে ঐ কোং মৌলিক কাজগুলি করাচ্ছেন তাঁদের মার্কিন সহযোগী বেক্‌টেল ইন্টারন্যাশনাল্‌কে দিয়ে, আর নিজেরা খুঁটিনাটিগুলি কষছেন, ফলে তাঁরা স্বনির্ভর নন। উত্তরে বলা হয় যে, মৌলিক ব্যাপারে কোনও 'সহযোগী'ই স্বনির্ভর হতে দেন না শেষ পর্যন্ত! দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয় যে, কোকচুল্লির মৌলিক তাপবলবিদ্যার হিসাবগুলি (thermodynamical calculations) কেউই হাতছাড়া করেন না।[৯]

আমদানী কারিগরি কি স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা যায়? এক কথায় 'না'। আমদানী কারিগরি পুরোপুরি শিখে নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টার পদে পদে বাধা। সহযোগিতা চুক্তির প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে কারিগরি হজম করা ও ছড়িয়ে দেওয়ার উপর ভিন্ন ভিন্ন রকমের নিষেধ দেখতে পাওয়া যায়।[১০] উৎপন্নের ছক পাল্টানো যাবে না, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নূতন কোনও উৎপন্ন তৈরী করা যাবে না, অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানকে কারিগরী তথ্য জানানো যাবে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চুক্তি ফুরালে কারিগরি আর ব্যবহার করা যায় না, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সব ছক, মাপজোখ ও অন্য তথ্য ফেরৎ দিতে হয়। চুক্তি এমন যে, অনেক সময়েই পুরো কারিগরিটি না জানালেও চলে, বিশেষ করে কারিগরী পদ্ধতিটি উদ্ভাবনের বুনিয়াদী অনুসন্ধান ও বিকাশের দিকগুলি। এছাড়া আমদানী কারিগরি জ্ঞান ব্যবহার করে নিজস্ব পেটেন্ট উদ্ভাবনও সাধারণতঃ নিষিদ্ধ থাকে।

গোপনীয়তার কড়া বাঁধন থেকে সরকারেরও রেহাই নেই। মার্কিন মার্ক কোং'র সঙ্গে পিম্প্রীর হিন্দুস্থান এ্যান্টিবায়োটিক্‌সের চুক্তি মতে কারিগরী জ্ঞান অননুমোদিত কাউকে তো জানানো যাবেই না, কর্মরত বিজ্ঞানীদের পর্যন্ত মার্ক-অনুমোদিত প্রণালীতে কারিগরির গোপনীয়তা রক্ষায় বাধ্য করতে হবে।[৩] এই ধরনের প্রক্রিয়ার ফলে আমদানী কারিগরি আটকে থাকে, দেশের সার্বজনীন জ্ঞানভাণ্ডারে যুক্ত হতে পারে না।

ভারতীয়দের অজ্ঞ রাখার ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিন তেল কোং'গুলির রেকর্ড ভাঙা কঠিন। ৬০ বছরের উপর ভারতে কাজ কারবার চালিয়েও তারা সম্ভবতঃ একটিও ভারতীয় তেল-প্রযুক্তিবিদ্ তৈরী হতে দেয় নি। কারিগরি শিক্ষাদানের ব্যাপারে সোভিয়েত মনোভাব প্রথমে বেশ ভালো ছিল। ভিলাই ইস্পাত প্রকল্পে ভারতে ও রাশিয়াতে মিলিয়ে পাঁচ হাজারের বেশী ইঞ্জিনীয়ার ও দক্ষ কর্মীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। কয়লা ধোওয়া বা তেল পরিশোধনের কারখানাগুলিতেও নকশা ও ব্লু প্রিণ্ট তৈরীর কাজে স্থানীয় সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু এখন সোভিয়েত মনোভাব দাঁড়িয়েছে অন্য বিদেশীদেরই মতো। পরিকল্পনা কমিশন চেয়েছিলেন বোকারো ইস্পাত প্রকল্প তৈরী হোক মূলতঃ ভারতীয় দক্ষতা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে। কিন্তু সোভিয়েতরা বোকারোকে একটি বোতাম-টেপা প্রকল্প হিসাবেই শেষ পর্যন্ত বানায়। ইস্পাত মন্ত্রণালয় নিযুক্ত সাধারণ বিশেষজ্ঞ দপ্তর কোং'র তৈরী বিস্তৃত রিপোর্ট সোবিয়েতরা কাজে

লাগাতে অস্বীকার করে এবং প্রকল্প খরচ কমানোর জন্য দস্তুর কোং'র প্রধান সুপারিশগুলিকে সব অগ্রাহ্য করে।[১২] ফলে বোকারোতে এত বড় কারখানা তৈরী হল, কিন্তু এতে ভারতীয় জ্ঞানের কোনও প্রয়োগ বা পরীক্ষা ঘটলো না, বরং এই কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার ও কুশলী শ্রমিকরা যে অমূল্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ভরতে পারতেন তা খালিই রয়ে গেল। মাইকেল কিড্রন উদ্ধৃত বিলাপ আজও প্রযোজ্য: ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররা দ্বিতীয় দামোদর উপত্যকা প্রকল্প বা ভাখরা-নাঙ্গল প্রকল্প তৈরী করার মতো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় পেরেছেন কি না তা সন্দেহের বিষয়!

আমদানী কারিগরির উপযোগিতা: আমাদের শিল্প ও অর্থ-নীতির প্রয়োজনের সঙ্গে কারিগরি আমদানি নীতির নাড়ীর বাঁধন ক্ষীণ। কারিগরি আমদানি নির্ভর করেছে বিদেশী সরবরাহকারী ও দেশী আমদানিকারীর মুনাফা সংক্রান্ত নীতির উপর। অনেক কারিগরি আমদানির পিছনেই কাজ করেছে আমাদের নির্মাতা ও ক্রেতাদের বিদেশী ছাপের প্রতি মোহ।

(ক) অপ্রয়োজনীয় কারিগরি আমদানী: বিদেশী ট্রেডমার্ক ভাঙিয়ে উপরি মুনাফা কামানোর পরিষ্কার উদাহরণ ঠাণ্ডাপানি, কালি, বলপেন, দাঁতের মাজন ও বুরুশ, দাড়ি কামানোর ব্লেড, রেফ্রিজারেটর, প্রসাধনসামগ্রী ইত্যাদি শিল্পের কারিগরি আমদানিতে। বিভিন্ন নামজাদা বিদেশী কোং'র সঙ্গে চুক্তি করে বিভিন্ন দেশী কোং'র একই কারিগরী জ্ঞান আলাদা আলাদা করে বহুবার আমদানির পিছনেও কাজ করছে বিদেশী ছাপ লাভের উৎকট আগ্রহ। ১৯৬৪ সালে অনুমোদিত ২৫০টি চুক্তির মধ্যে ৪২টি রেডিও ও তার পার্টসের জন্য, ১৫টি রেফ্রিজারেটরের জন্য, ১৪টি ওভালটিন ধরণের খাবারের জন্য, ১২টি পোষাকের জন্য, ৮টি পেনের জন্য, ৮টি সুঁচের জন্য ও ৭টি ছাপার যন্ত্রপাতির জন্য। এগুলি মিলেই ১০৬, সব চুক্তির প্রায় অর্ধেক। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৪র মধ্যে ঢালাইর জন্য ৩৩টি, বিদ্যুত পরিবাহী কাছির জন্য ১২টি, রেডিও ও ট্রানসিস্টরের জন্য ১২টা ও বল-বেয়ারিংয়ের জন্য ১৮টি চুক্তি হয়।[১০] তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকার ট্রাক ও স্কুটার তৈরীর জন্য যথাক্রমে ৪টা ও ৭টা কোং'কে অনুমতি দেন, প্রত্যেকেই এক একটা আলাদা বিদেশী সহযোগী পাকড়ায়।[৩] সমস্ত আমদানী কারিগরির মধ্যে নূতন কারিগরির অংশ ১৯৬১-৬২তে ছিল ৭০%, ১৯৬৫-৬৬তে এই অংশ নেমে আসে ৪৩%তে। অর্থাৎ বেশীরভাগ চুক্তির ফলেই জানা কারিগরি আবার আমদানি হচ্ছিল, বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়ারিং, রাসায়নিক দ্রব্য ও বস্ত্র শিল্পে। মাটির তেল থেকে তৈরী রাসায়নিক দ্রব্যের শিল্পে ১০টিরও বেশী চুক্তি ছিল পলিএথিলিন সম্পর্কে, বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে ৭৩টির মধ্যে ৩৮টিই ছিল পুনরাবৃত্তি।[১]

(খ) অনুপযুক্ত কারিগরি আমদানী: বিদেশী সরবরাহকারীর ঝোঁক হচ্ছে তার উদ্বৃত্ত উৎপাদন আমাদের দেশে গছানো। ফলে অনেক কারিগরিই আমদানি হয়েছে আমাদের দেশের বাস্তব পরিস্থিতির দিকে না তাকিয়েই। তাই মাদ্রাজের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ কেন্দ্রের ডিরেক্টর শ্রীরামস্বামীকে বলতে হয় যে, মধ্যপ্রদেশের একটি সরকারী প্রকল্পে তিনি লক্ষ্য করেন যে, ইস্পাতের ছাতের এক বিশেষ অংশের (roof trusses) ছকে প্রচণ্ড তুষারপাতের সম্ভাবনাকে ধরা হয়েছে! বলা বাহুল্য, প্রকল্পের কারিগরি যে দেশ থেকে আমদানি সেখানে শীতে ঘটে ঘন তুষারপাত।[১১ক] সাধারণভাবেই বলা যায় যে, আমদানি কারিগরি খাপ খায় অন্য আবহাওয়া, আলাদা কাঁচামাল ও ভিন্ন দক্ষতার শ্রমশক্তির সঙ্গে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার যে ছড়াছড়ি থাকে তা আমাদের দেশের প্রচুর শ্রমশক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর সমস্যার সঙ্গে সঙ্গতি রাখে না। নিখিল ভারত শিল্প সমিতি (All India Assoc. of Industries) বলেন, তাঁদের দেখা বিদেশী সহযোগিতায় চালু প্রায় প্রতিটি কারখানায় অদরকারী যন্ত্রপাতির ভিড় ছিল। কোথাও ৬০,০০০/৮০,০০০ টাকা বিদেশী মুদ্রায় কেনা কাঁটা দিয়ে তুলবার ট্রাক অলস, কাজ করছে আসলে ১৫০০০ টাকা দামের দেশী পায়ে টিপে তুলবার ট্রাক। কোথাও বিদেশের দামী স্বয়ংক্রিয় লেদ পড়ে আছে, কাজ চালাচ্ছে দেশী ক্যাপস্টান লেদ। বৈদ্যুতিক মাপ-জোখের যন্ত্র তৈরীর এক কারখানায় আমদানী ১০টি ড্রিলিং মেশিনের ৬টিই বিনা দরকারে অচল পড়ে ছিল।[১]

বোকারোতে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে যাওয়ার যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তার খরচ উপস্থিত তো দিতেই হয়েছে, সময়ের সঙ্গে আরও মূল্য ধরতে হবে। ইস্পাত তৈরীর কারিগরি উন্নতি দ্রুত ঘটে চলে, তাই ১৫।২০ বছর পরে যে উৎপাদন ক্ষমতা চূড়ান্ত রূপ নেবে তা ততদিনে বাতিল ও মাগগি বলে ধার্য হতে বাধ্য। তা ছাড়া এত বছর ধরে অমূল্য বিনিয়োগ কাজে লাগবে না, আমাদের মতো পুঁজির হাহাকার পীড়িত দেশের পক্ষে তা'ও কম ক্ষতি নয়। চেকোস্লোভাক সহযোগীরা রাঁচীর MEC কারখানার কামারশালার কাঠামোর ছক প্রয়োজনের তুলনায় এত জটিল করেছে যে, কোন ভারতীয় নির্মাতাই ঐ কাঠামোর কাজে হাত দিতে পারেন নি, সবই শেষে আমদানি করতে হয়। পরিকল্পনা কমিশনের মতে এর ফলে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে।[১২] আমাদেয় দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই এমন কারিগরি চাপিয়ে দেওয়ার জন্য পূর্ব ইয়োরোপীয়রা বেশ বদনাম কিনেছে। সোভিয়েত সহযোগিতায় বানানো শল্যচিকিৎসার যন্ত্রের কারখানার মাল ভারতে অচল বলে প্রকাশ হয়েছে।[৪] ফলে পুরো মালই কিনে নিয়ে যায় সোভিয়েৎ সংঘ। জরুরী অবস্থার সুযোগে সোভিয়েৎ সংঘ ভারতে HMD (প্লাজমা) বিদ্যুৎ উৎপাদক বিক্রি করে গেছে, যদিও এই জেনারেটরের কোনও

প্রয়োজনই ভারতের নেই। উপরন্তু সোভিয়েত সংঘেই তখন পর্যন্ত এই কারিগরি বাজারে ছাড়ার মত অবস্থায় ছিল না।

(গ) বাজে ও বাতিল কারিগরি ঘাড়ে চাপানো: বিদেশী কারিগরির ব্যাপারে আমাদের মোহ, অজ্ঞতা ও অসহায়তার ফায়দা তুলে যাচ্ছে বিদেশীরা। তবে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। এক বৃটিশ সংস্থা দুর্গাপুরের রোলিং মিল অঞ্চলের যে ভিত্তি গেঁথেছিল তা ধ্বসে পড়লে বৃটিশ সরকারকে শুধরানোর দায়িত্ব নিতে হয়।[১২] হিন্দুস্থান শিপ্‌ইয়ার্ডস্‌ জাহাজ কারখানায় তৈরী জাহাজের দোষের খোঁজে বসানো এক তদন্ত কমিটি ফরাসী সহযোগীদের দায়ী করলে পরে ঐ সহযোগিতা বন্ধ করা হয়। হিন্দুস্থান মেশিন টুল্‌স্‌-এ সুইজারল্যাণ্ডের ওয়েরলিকন কোং'র সহযোগিতা সম্পর্কে নেহেরু মন্তব্য করেন: 'যতদিন কারখানাটা বিদেশী বিশেষজ্ঞদের হাতে ছিল, ততদিন কোনও ভালো কাজ হয় নি। কিন্তু বিদেশীরা চলে যাবার পর আমাদের উপযুক্ত লোকদের কাঁধে দায়িত্ব আসাতে আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে।[৩] সোভিয়েতেরা পঞ্চাশের দশকে লক্কড় জীপ উবুড় করে যায়, আবার ষাটের দশকে পাঠায় ট্রাক্টরের ঝড়তি পড়তি পার্টস্‌। এইসব কেলেংকারি ছাড়াও সোভিয়েত সহযোগিতায় তৈরী কারখানাগুলি নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে দেরীতে চালু হওয়ার জন্য নাম কিনেছে। বারাউনি তেল পরিশোধনাগারে কোকিং ইউনিটের ছকের দোষ উৎপাদন ক্ষমতাকে আটকে রেখেছিল ১৮ মাস। এইরকম দেরীর ফলে খরচ দ্রুত বাড়তে থাকে। বোকারো এর সর্বোত্তম উদাহরণ। ১৯৭৫ সালেই বলা হচ্ছিল যে ৪০ লক্ষ টন ক্ষমতায় পৌঁছাতে বোকারোতে ১০৯০ কোটি টাকা লাগবে, যদিও প্রথম হিসাব ছিল মাত্র ৭৭০ কোটির টাকার।[৫] এখন খরচের আন্দাজ নিশ্চয় আরও অনেক বেড়ে গেছে।

বোকারোতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর কারিগরি আমদানির ফলে। ১৭ লক্ষ টন ইস্পাত ইন্‌গট তৈরী করতে সোভিয়েতরা ৪৫টি পুরানো আমলের ১০০ টনের এল. ডি. কনভার্টার বসিয়েছে, যেখানে আধুনিক ধারা অনুসারে একটি ৩০০০ টনের এল. ডি. কনভার্টার থেকে ২০ লক্ষ টন ইন্‌গট পাওয়া যায়। ফলে মূলধন ও ধারাবাহিক দুই খাতেই খরচ বেশী পড়েছে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় আধুনিক অবিরাম ঢালাই পদ্ধতির বদলে পুরানো কায়দায় স্ল্যাবিং মিল বসানো হয়েছে। আধুনিক পদ্ধতি নিলে মূলধনে খরচ পড়তো ৫০% থেকে ৬০% কম ও ইস্পাতের উৎপাদন হতো ১০% বেশী। ধারাবাহিক খরচও কম পড়তো।[১২] বিরাট উৎপাদন ক্ষমতার ও বিশাল মূলধনের এই কারখানায় এর ফলে আমাদের ক্ষতি অপূরণীয়, কারণ সময়ের সঙ্গে বোকারোর কারিগরী পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে আরও পিছিয়ে পড়বে, উৎপাদনের খরচ বাবদ লোকসান বাড়তে থাকবে। সম্প্রতি টাটার টিস্কোতে অবিরাম ঢালাই পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হল। ফিল্ম তৈরীর সরকারী প্রকল্পে ফরাসী কারিগরি ও সার শিল্পে ইতালীয় কারিগরিও নিকৃষ্ট প্রমাণিত হয়েছে।[৭]

সরকারী প্রকল্পগুলিতে একবারে এক বিরাট ঢোঁকে এক একটি বিদেশী কারিগরি গিলে ফেলার চেষ্টার ফলে সময়ের সঙ্গে দুনিয়া জুড়ে কারিগরী অগ্রগতির পাশে এই প্রকল্পগুলি জরদ্গব ফসিল কারিগরির নমুনা বনে বসে থাকছে। এর ফলে উৎপাদনের খরচ বাড়ছে, উৎপাদন ক্ষমতার পুরোটা ব্যবহার হচ্ছে না, উৎকর্ষ ম্লান হচ্ছে ও উৎপন্ন বাজারে কল্কে পাচ্ছে না।

জাতীয় কারিগরী উদ্ভাবন ও গবেষণা বাড়তে পারছে না: বিদেশী কারিগরির ঢালাও আমদানির সবচেয়ে খারাপ ফল ফলে আমাদের নিজেদের উদ্ভাবনের ক্ষমতা ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে।

(ক) উদ্ভাবন ও গবেষণায় অনিচ্ছা আসে: আমাদের মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ২/৫% ব্যয় হয় গবেষণার খাতে, যেখানে সোভিয়েত সংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের বেলায় এই অংশ যথাক্রমে ৪·৩%, ৩·২% ও ১·২%।[১১খ] তাছাড়া ভারতের পুঁজিপতিরা গবেষণায় খরচ করতে নারাজ। রাসায়নিক এবং শিল্পে বিক্রির আয়ের ১%ও গবেষণায় খরচ হয় না, আন্তর্জাতিক হার যেখানে ৫·১৫%।[১০] একই সমীক্ষায় প্রকাশ পায় যে বিদেশী নিয়ন্ত্রিত কোং'গুলি গবেষণা চালায় আরও কম। গবেষণায় যা খরচ হয় তার ৯২-৯৪%ই করে সরকার।[১১গ] একথা বলা বাহুল্য যে, বিদেশী কোং'র শাখাগুলি বা তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোং'গুলি এদেশে গবেষণা চালাতে একেবারেই ইচ্ছুক নয়। আর ভারতীয় পুঁজিপতিরা নিজেরাও যেমন গবেষণায় অনাসক্ত, সরকারী গবেষণাগারে উদ্ভূত কারিগরি কাজে লাগাতেও তারা তেমনই অনাগ্রহী। গবেষণার ফল ও তা কাজে লাগানোর সাধারণ কাঠামোতে তারা সন্তুষ্ট নয়। তারা চায় গবেষণালব্ধ প্রক্রিয়া কারখানায় চালু করার সব খুঁটিনাটি এমন কি কারখানার নকশা ও ছক, মায় কারখানা বসিয়ে উৎপাদন করা পর্যন্ত সব কিছুর নির্দেশ ও তার গ্যারান্টি। এ ধরনের গ্যারান্টী কোনও দেশের কোনও গবেষণাগার দিতে পারে না (অভিমতটি স্বয়ং শ্রী আত্মা রামের)। অন্যদিকে বিদেশী কারিগরি কাজে প্রমাণিত ও বহুপরীক্ষিত। পুরানো বা মাগগি বা কঠোর শর্তে বাঁধা থাকলেও এই বিদেশী কারিগরি আমদানি করে উৎপাদন শুরু করাটাকেই ভারতীয় পুঁজিপতি নিরাপদে লাভজনক মনে করে। এই মনোভাব লালিত হচ্ছে দেশের বদ্ধ অর্থনীতির জন্য, দ্রুত প্রসারমান বাজারে যে প্রতিযোগিতার তাগিদ জন্মায় তার অভাবের ফলে। মাঝারি কিছু শিল্পোদ্যোগীর মধ্যে গবেষণা চালানো ও তার ফল প্রয়োগে ইচ্ছা থাকলেও অর্থাভাব ও বাজারের ছোট গণ্ডীর জন্য বাস্তব অগ্রগতি ঘটানো এঁদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।

মোড়কে আমদানির পদ্ধতিতে গোটা কারিগরিটা অদলবদল ছাড়াই

আমদানি হয়। চালু করা পর্যন্ত আসল জায়গাগুলিতে বসে থাকে বিদেশী পরিচালকেরা। ফলে দেশের প্রয়োজনে কারিগরি সংস্কার, প্রয়োগ ও পরিবর্তনের কাজে দেশের ইঞ্জিনীয়ার, বিজ্ঞানীদের শিক্ষা ও দক্ষতা কাজে লাগে না। একবার চালু হওয়ার পরেও সংস্কার ও পরিবর্তনের জন্য বিদেশী সহযোগীর উপর নির্ভরশীলতা থেকেই যায়।

মূল্য যাই পড়ুক, হাত বাড়ালেই বিদেশী কারিগরি পাওয়া যাবে, এই মনোভাব থেকে সরকারও মুক্ত নয়। বৃহৎ সরকারী উদ্যোগগুলিতে ছক কাটার বড় বড় দপ্তর থাকে। থাকে না বিকাশের জন্য বা বিকাশের উৎস যেখানে সেই গবেষণার জন্য সংগঠন। অজানা (ও কিছুটা গোপন) বিদেশী কারিগরির ভিত্তিতে পুরোপুরি বিদেশী সহায়তায় তৈরী এই বিশাল শিল্পোদ্যোগগুলির গবেষণা ও বিকাশ ঘটানোর জন্য কোনও সক্রিয় নীতি নেই। তারা কিছুই উদ্ভাবন করে না, তাই ছক কাটার দপ্তরের হাতেও কোনও কাজ থাকে না।

গবেষণা নাই—কারিগরি নাই—তাই কারিগরি আমদানি—ফলে গবেষণা নাই, এই দুষ্টচক্র বিদেশী কারিগরির উপর এক অনন্তনির্ভরতা গড়ে তুলছে। পেটেন্টের পরিসংখ্যান থেকে দেশের মধ্যে কারিগরী উদ্ভাবনের স্বল্পতা ও পরনির্ভরতার ছবিটি দেখা যায়। ১৯৭০ সালের আগে বছরে গড়ে ৪৬০০টি করে পেটেন্ট দেওয়া হচ্ছিল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই রকম সংখ্যা পাওয়া যাবে এক শতাব্দী আগে। এই হারও কমে এসেছে।[১১খ] কিড্রন দেখেছিলেন যে, তাঁর সময়ে চালু ১৪,০০০ মতো পেটেন্টের ৯০% ছিল বিদেশীদের নামে।

(খ) দেশী কারিগরি প্রয়োগের পথে বাধা: এই প্রতিকূল আবহাওয়াতেও ভারতে গবেষণার ফল বেশ আশাপ্রদ। হিন্দুস্থান এ্যান্টিবায়োটিক্সে তৈরী অরিওফাঙ্গিন, নিওমাইসিন, হ্যামাইসিন ও বিভিন্ন ভিটামিন, হিন্দুস্থান মেশিনটুল্সে তৈরী 'মিনিচাকার' (mini-chucker), সিলিকন কার্বাইড তৈরীর প্রথম ধাপ পর্যন্ত অগ্রগতি, এগুলি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডেও বেশ উৎকৃষ্ট অবদান।

সিলিকন কার্বাইডের উদাহরণটি শিক্ষণীয়। দেশী নির্মাতারা সরকারের কাছে গ্যারান্টী চান যাতে এই ক্ষেত্রে কোনও বিদেশী সহযোগকে ঘেঁষতে দেওয়া না হয়। অন্যদিকে বিদেশী সহযোগের পক্ষপাতী এক দেশী চক্র বিদেশী কারিগরি আমদানির জন্য জঘন্য কায়দাকৌশল নিতে থাকে। দুঃখের বিষয় যে এমন একটি রণনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন জিনিসের বেলাতেও CSIR বা NRDC ঠিক সময়ে অর্থসাহায্য না যোগাতে পারায় ঐ চক্রের হাতই শক্তিশালী হয়। উদাহরণটি থেকে দেখা যায় ভারতীয় কারিগরির অগ্রগতির পথে বিদেশ থেকে কারিগরি আমদানি কত বড় বাধা।[১১ঙ]

ছোট হারে সোডিয়াম এ্যাজাইড রাসায়নিক দ্রব্যটির উৎপাদনের কারিগরিও দেশে উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু এই দ্রব্যের আমদানি অব্যাহত রইল এবং এর এক বড় ব্যবহারকারী বিদেশী কারিগরি আমদানি করার হুমকি দিতে থাকলেন। ফলে উৎপাদকের টিঁকে থাকাই মুস্কিল হয়ে পড়লো।[১১ঙ] বিয়ারিং শিল্পে অনুরূপ ঘটনা ঘটে। এক ভারতীয় সংস্থা কেনেও বিদেশী সাহায্য ছাড়াই বল ও রোলার বেয়ারিং তৈরীর সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিলেন। এমন সময় সুইডিশ এম. কে. এফ. কোং'র সঙ্গে টাটা বেয়ারিং বানানোর সহযোগ চুক্তি সম্পন্ন করলো। বিদেশী চাপের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নিষ্ফল ধরে নিয়ে প্রথম সংস্থাটি তখন অন্য এক নামকরা বিদেশী সংস্থার সঙ্গে সহযোগ চুক্তি করতে বাধ্য হয়।[৪]

(গ) দেশে উদ্ভাবিত কারিগরি চেপে দেওয়ার নীতি: বিদেশী কারিগরি আমদানির চাপে দেশে উদ্ভাবিত কারিগরির দম বন্ধ হওয়ার উদাহরণ অনেক। দুর্গাপুরের সরকারী CMERI কারখানা ২০ হর্সপাওয়ার ক্ষমতার 'স্বরাজ' ট্রাক্টরটি উদ্ভাবন করেন। এর প্রোটোটাইপ তৈরী হয় গবেষণাগারে ও তা সফলভাবে চালু হয় ভারত সরকারের ট্রাক্টর পরীক্ষার স্টেশনে। কিন্তু বিদেশী কারিগরির প্রতি পক্ষপাতে ভারতীয় পুঁজিপতিরা 'স্বরাজ' তৈরী করতে অনিচ্ছা দেখাতে থাকে। অবশেষে সরকারী HMT কারখানা চেকোস্লোভাক 'জিটিওর' ট্রাক্টর তৈরীর এক বোতাম-টেপা প্রকল্প চালু করে। ভারতের সার কর্পোরেশন FCI'র বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়াররা সার তৈরীর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় লাগে এমন এক সারি অনুঘটক তৈরী করেছেন। এ ছাড়া ইতালী থেকে তাঁরা সার কারখানা চালু করার ছক ও ইঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞান যোগাড় করেন। কিন্তু সার কারখানা তৈরীর পুরো জ্ঞান ও ক্ষমতা তাঁদের করায়ত্ত হওয়া সত্ত্বেও ৫টি সার কারখানা তৈরী করতে দেওয়া হল মার্কিন সহযোগপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীরাস্ ইণ্ডিয়াকে। এরা আবার অর্ডারগুলি বোতাম-টেপার চুক্তিতে তুলে দিল টয়ো ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের হাতে।[১] জাতীয় কয়লা বিকাশ সংস্থা NCDCর প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সরকারী কয়লা খনির প্রকল্প রিপোর্ট, নকশা, ছক ইত্যাদি যাবতীয় কাজ তুলে দেওয়া হতো বিদেশী সহযোগীদের হাতে।[৩] কিড্রন মন্তব্য করেছেন, নির্দিষ্ট বা তার চেয়েও উচ্চ মানের স্থানীয় বিশেষজ্ঞ থাকলেও মোটা পারিশ্রমিক দিয়ে বিদেশী বিশেষজ্ঞ ডেকে আনার জন্য সরকার কুখ্যাত।

(ঘ) স্বয়ংনির্ভরতার কোনও সার্বিক পরিকল্পনা পরিষ্কার হয় না: প্রতি ব্যাপারেই কারিগরি আমদানির সম্ভাবনা থাকে বলে কখনোই বিচার করা হচ্ছে না কোন্ কোন্ প্রশস্ত ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হতে পারলে অল্প আয়াসেই অসংখ্য অন্য ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা আসতে পারে। তাই স্বয়ংনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যপথে গবেষণা ও কারিগরী উদ্ভাবনের সার্বিক কোনও পরিকল্পনা দেওয়া হচ্ছে না। বড় বড় প্লান্টের ছক বানানো ও প্ল্যান্ট তৈরীর (design & fabrication) কারিগরী জ্ঞানের অভাবের ফলে বহু শিল্পে দেশী কারিগরি ব্যবহার

সম্ভব হচ্ছে না। যেমন, চীনামাটি ধোয়া ও চীনামাটির জিনিস তৈরীর জন্য সরকারী CGCR সংস্থার বিভিন্ন পরিকল্পনা আছে ; কিন্তু মাটির জিনিসের সব বড় কারখানাগুলিই চলছে বিদেশী কারিগরিতে, কারণ ব্যবসায়িক হারে চীনামাটি ধোয়ার প্লান্টের যন্ত্রপাতি বা সুড়ঙ্গ তুঁদুর (tunnel kiln) তৈরী করার জন্য যে কারিগরী গবেষণা দরকার তার প্রতি দৃষ্টি নেই। ধানবাদের CMRI সরকারী গবেষণাগার ও হায়দ্রাবাদের আঞ্চলিক গবেষণাগার কয়লার অঙ্গারীভবন ও গ্যাসীকরণ এবং কয়লা নিয়ে অন্যান্য প্রক্রিয়া চালানোর ব্যাপারে গবেষণা চলিয়েছেন, তবু ইস্পাত কারখানায় কোকচুল্লি বা সার কারখানায় কয়লা গ্যাসীকরণ ইউনিটের জন্য আজও বিদেশী কারিগরি ছাড়া চলা যাচ্ছে না। মহীশূরের CFTRI সরকারী খাদ্য গবেষণাগারে দীর্ঘ দিন ধরে ফলের রস, উদ্ভিজ্জ প্রোটিন ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা চলছে, তবু ফলের রসের কারখানা বসাতে বুলগারীয় সহযোগ দরকার হল।[১]

কোন্ কোন্ সাধারণ ও বিশেষ কারিগরি উদ্ভাবিত হলে এই সমস্ত গবেষণাগারের কাজের সফল কারিগরী প্রয়োগ ঘটতে পারে তা নিয়ে চিন্তা বা পরিকল্পনা আশা করা বৃথা হবে যতদিন কারিগরি আমদানিকে দেখা হবে প্রতিটি তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর একটি গ্রাহ্য পথ হিসাবে।

কারিগরি আমদানির প্রত্যক্ষ খরচ : কারিগরি আমদানির মধ্য দিয়ে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ফলে যে লুঠ চলছে তার মধ্যে আমরা যাচ্ছি না। যে খরচটা সরাসরিভাবে চোখে পড়ে কেবল সেটা নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। প্রথমেই একটি মোটামুটি ছবি দেখে নেওয়া ভালো। দেশী ও বিদেশী কারিগরী জ্ঞানের পিছনে ভারত প্রায় সমান সমান খরচ করে, আর জাপানের বেলায় এই অনুপাত ৭ : ১।[১]

বিদেশী কারিগরি ব্যবহার বাবদ রয়ালটি, পেটেন্ট ফী, কারিগরী ও অন্য পেশাদারী কাজ বাবদ ফী এই সব মিলিয়ে কারিগরি আমদানির প্রতিদান ১৯৫১ ও ৬০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে যায়। (কারিগরি রপ্তানি যে পুঁজি রপ্তানির কতো ফলপ্রদ এক পথ তার প্রমাণ, একই সময়ে বিদেশী বিনিয়োগ অর্জিত মুনাফা মোটে ১/৬ ভাগ বাড়ে।) ১৯৪৮ থেকে ১৯৬১'র মধ্যে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ১০৬'৬ কোটি টাকা শুষে নেয় কেবল কারিগরি আমদানির উপর পারিশ্রমিক বাবদ, যদিও তাদের মোট বিনিয়োগই ছিল ২৪৭'১ কোটী টাকা। ঐ পারিশ্রমিকের সঙ্গে ৩৮১ কোটী টাকার মুনাফা ও ১৪১'১ কোটী টাকার ফেরৎ (repatriated) পুঁজি যোগ দিলে দেখা যায় ঐ সময়ে বিদেশে গেছে মোট ৭১৮'৪ কোটী টাকা। তাহলে এই সময়কালে বিদেশী পুঁজিপতিরা নীট ৪৭১'৩ কোটী টাকার বিদেশী মুদ্রা শুষে নেয়। একটি উদাহরণ : ফাইজার ঔষধ কোং'র ভারতীয় শাখা ১২ বছরে বিদেশে ৬৮ লাখ টাকার লভ্যাংশ পাঠায়, যা তাদের ৫ লাখ টাকার প্রাথমিক বিনিয়োগের ১৩ গুণেরও বেশী।[৩]

রয়ালটীর উচ্চতম সীমা এখন বিক্রি থেকে আয়ের ৫%। তাই ঝোঁক এখন বিশেষজ্ঞের পারিশ্রমিক, সরবরাহকৃত মালমসলার দাম বাড়ানোর দিকে, অথবা কারিগরী ফী হিসাবে এককালীন থোক টাকা সংগ্রহ। পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলি সাধারণতঃ থোক কারিগরী ফী নিতে আগ্রহী। অবশ্য কারিগরি বাবদ প্রতিদান তারা ভারতীয় কোম্পানীতে মালিকানার অংশ শেয়ার) বা রয়ালটি মারফৎ নিচ্ছে এমন একাধিক উদাহরণও আছে।[৫] ১৯৬০-৬৭তে ২৪টী বৃহৎ সরকারী উদ্যোগ রয়ালটী পিছু ২'১৫ কোটি টাকা ও কারিগরী ফী পিছু ২৬'৩৯ কোটি টাকা প্রতিদান দেয়। রয়ালটীর ৫ ভাগের ৩ ভাগ যায় বৃটেনে এবং কারিগরী ফী'র অর্ধেকই যায় পূর্ব ইয়োরোপে, তার মধ্যে ১০'০৬ কোটি টাকা সোভিয়েত সংঘে।[৬] ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে আমাদের দেশ পূর্ব ইয়োরোপ থেকে নেওয়া ৫৯'৫ কোটি টাকার উন্নয়নী ঋণ কাজে লাগায়, কিন্তু একই সময়কালে সে ৫৮ কোটি টাকা দিতে বাধ্য হয় কেবল কারিগরী প্রতিদান হিসাবে। তাহলে বিনিয়োগের নীট হিসাবে এই সময়কালে অন্ততঃ ভারত পূর্ব ইয়োরোপ থেকে কার্যতঃ কোন সাহায্যেই পায়নি[১৬]।

বিশেষজ্ঞদের পারিশ্রমিক কী রকম ? মার্কিন এক বাঁধ-বিশেষজ্ঞ ভারতে সব খরচ ছাড়া ১০ বছরের চুক্তিতে মাসে ১০,০০০ টাকা করে পেতেন। সিন্ধ্রীর সরকারী পেনিসিলিন কারখানার মার্কিন বিশেষজ্ঞরা দিনে ১০০ ডলার চেয়েছিলেন। বোকারোর রুশ বিশেষজ্ঞরা মাসে পেতেন ১১৬—৩৮০ রুবল। এ ছাড়া ছিল ৪৪—৮৩টা : দৈনিক ভাতা, ৪০০—৭৫০ টা: স্থানান্তর ভাতা, পরিবার ও ২৪০ কেজি মাল সহ বিনামূল্যে বিমানে প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াতের সুযোগ, দু'বছরে একবার ছুটিতে বিমানে প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াতের সুযোগ, মস্কো যাতায়াতের পথে দিল্লী ও বোকারোতে হোটেল ও যাতায়াতের খরচ, বীমা, মোটরগাড়ি, তাপনিয়ন্ত্রিত ও পরিপাটি করে সাজানো অফিস ও বাড়ি, হাসপাতাল সহ চিকিৎসার খরচ, স্কুল, ক্লাব ও ভ্রমণের ব্যবস্থা—সমস্তই নিষ্কর।[১২] সাধারণভাবে ইস্পাত প্রকল্পে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ তুলনীয় পদের ভারতীয়ের দ্বিগুণ পারিশ্রমিক পেয়ে এসেছে।[১৩]

সারসংক্ষেপ : বিরাট খরচ করে আমরা কারিগরি আমদানি করছি। কিন্তু একদিকে সেই কারিগরির গোটাটা, বিশেষ করে তার বুনিয়াদ, কখনোই আমাদের আয়ত্তে আসছে না, বরং এই আমদানি আমাদের নিজস্ব কারিগরী গবেষণা ও উদ্ভাবনের কাঁধে সিন্ধবাদের বুড়োর কায়দায় চেপে বসেছে। বিদেশী কারিগরির উপর আমাদের নির্ভরতা

বেড়েই চলেছে, যা ডেকে আনছে অনন্ত নির্ভরতার ভয়। যে কারিগরি পাচ্ছি তার উৎকর্ষ ও উপযোগিতাও প্রশ্নাতীত নয়। অন্যদিকে কারিগরি আমদানির ফাঁক দিয়ে বিদেশী পুঁজির প্রভাব ঢুকছে অবাধে, বিদেশী নিয়ন্ত্রণকে করছে পোক্ত ও স্থায়ী।

জাপান ও চীনে কেমনটি ঘটেছে?: কখনো কখনো জাপানের উদাহরণ তুলে বলা হয় যে কারিগরি আমদানির সর্ষেতে ভূত নেই, ভূত আমাদের কাঁধে, আমরা সঠিক কায়দায় কারিগরি আমদানি করে তাকে কাজে লাগাতে পারছিনা। বলা হয়, আমরা মোড়কে মোড়া কারিগরি আমদানি করেই ভুলে করছি, জাপানের মতো সরাসরিভাবে পেটেন্ট ইত্যাদিরূপে ঘনীভূত কারিগরী জ্ঞান কিনে নিয়ে প্রয়োজন মতো সংস্কার করে প্রয়োগ করলেই সমস্যা মেটে। জাপানী পদ্ধতি অবশ্যই মোড়কে কারিগরি আমদানির চেয়ে উন্নত। কিন্তু জাপানে প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই শিল্প, অর্থনীতি ও কারিগরির এমন একটি কাঠামো তৈরী হয়েছিল, যেখানে কারিগরী জ্ঞান সরাসরি কিনে প্রয়োগ করা গিয়েছিল। আমাদের অর্থনীতি এক বদ্ধ জলা, পুঁজি সীমিত, পুঁজি সৃষ্টির হার নৈরাশ্যজনক, শিল্প পরনির্ভর ও বিদেশমুখী, এবং কারিগরী কাঠামো অনগ্রসর ও অপরিণত; শত সদিচ্ছা সত্বেও কারিগরী আমদানির নীতি এখানে সরকারী প্রতিজ্ঞার বাঁধ ভেঙে নিজস্ব যে স্বাভাবিক খাতে বয়ে যাবেই তা একমাত্র মোড়কে মোড়া ও বোতাম টেপা কারিগরিই নিয়ে আসতে সক্ষম হবে।

এখানে স্মরণ করা যায় চীনের কথা, ১৯৬০ সালে যখন সব সোভিয়েত সাহায্য বন্ধ হয়ে গেল ও সব রুশ বিশেষজ্ঞ একবাক্যে চলে গেল। কারিগরী জ্ঞানের অভাব নিয়ে চীন দাঁড়িয়েছিল একই ধরনের সমস্যার সামনে। সমস্যা সমাধানের যে পথ তারা বেছে নেয় তাতে কারিগরি আমদানি প্রধান ছিল না, প্রধান ছিল স্বয়ংনির্ভর হওয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন। একটি উদাহরণ ধরা যাক। ১৯৬৪ সালে হোনান মেশিন কারখানার শ্রমিকরা ঠিক করলেন তাঁরা ময়দার কল বানাবেন। পুরনো একটি কল খুলে তার যন্ত্রপাতি ভালো করে দেখা হল। তারপর স্থানীয় প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খায় কম খরচের এমন একটি কলের ছক তৈরী হল। এরপর বানানো হল ফেলে দেওয়া ধাতু ও তার দিয়ে ৩০টি মেশিন টুল। তা দিয়ে এবার বড় হারে কল তৈরী হতে লাগলো। যে বই এই উদাহরণটি তুলে ধরেছে, সেটি আদৌ চীন সমর্থক নয়।[১] তার মন্তব্য: "কলটি নিশ্চয়ই আধুনিক কারিগরী মান অনুসারে খুব দক্ষ ছিল না, কিন্তু দেশটির পলকা কারিগরী ভিতের কথা ভাবলে মানতে হয় যে এটি একটি বড় দরের অবদানের প্রতীক ছিল।.....এই ধরনের হাজার হাজার উদ্ভাবনের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন জলে-ঠাণ্ডা ট্রান্সফর্মার, অতি উঁচু দরের কোয়ার্টার কাঁচ বা সুতী রং করার বড় মেশিনের বেলায় অতি উত্তম ফল পাওয়া গিয়েছিল।"

এই 'মাওবাদী উন্মত্ততার' নীট ফল কী দাঁড়ালো? ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত সাহায্য নিয়ে চীন প্রথম ধারাবাহিক পারমাণবিক বিভাজন (chain reaction) চালাতে সমর্থ হয়। ১৯৬০ সালে সোবিয়েত সংঘ সাহায্য গুটিয়ে নেয়। ১৯৬৪ সালে চীন তার প্রথম পারমাণবিক বোমা ফাটায়। ১৯৬৭ সালে, ২ বছর ৮ মাস পরে, ফাটায় প্রথম তাপ পারমাণবিক (হাইড্রোজেন) বোমা। ফ্রান্সের ক্ষেত্রে এই দুই ধরণের বোমা উদ্ভাবনের মধ্যে সময় গিয়েছিল ৮½ বছর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ৭ বছর, বৃটেনের ক্ষেত্রে (মার্কিন সাহায্য নিয়ে) প্রায় ৫ বছর, সোভিয়েত সংঘের ক্ষেত্রে ৪ বছর। পুরোপুরি চীনে তৈরী জেট বিমান দেখা যায় প্রথম ১৯৫৮ সালে। ১৯৬৫ সালের মধ্যে শব্দের দ্বিগুণ গতি সম্পন্ন মিগ ২১ বিমানের প্রথম চীনা মডেল তৈরী হয়ে পড়ে। শব্দের গতির কাছাকাছি গতিসম্পন্ন মাঝারি পাল্লার পারমাণবিক বোমারু বিমান তৈরী হয় ১৯৭০ সালের মধ্যে। চীন যে উপগ্রহটী ছোঁড়ে তার ওজন ঐ সময় পর্যন্ত ফ্রান্স বা জাপানের পাঠানো যে কোনও উপগ্রহের চেয়ে বেশী ছিল। কম্পিউটারের ক্ষেত্রেও চীনের গতি একই রকম। প্রথম প্রোটোটাইপ কম্পিউটার থেকে ইন্টীগ্রেটেড সার্কিট (IC) পর্যন্ত আসতে চীনের লাগে ১০ বছর, যেখানে সোভিয়েত সংঘের লেগেছিল ১৫ বছর।[১]

কারিগরির ক্ষেত্রে এরকম 'উন্মাদের' মতো অগ্রগতি হয়তো সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছু 'উন্মাদের' মতো পদক্ষেপ না ফেলে সম্ভব নয়। তবু চীনের দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, কারিগরি আমদানির উপর প্রধান জোর না রেখে নিজস্ব ক্ষমতার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে কারিগরির ক্ষেত্রে বিশাল অগ্রগতি আনা তথাকথিত অনগ্রসর দেশের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

উপসংহার: কারিগরি আমদানির নীতির খোল-নলচে না পাল্টালে কোনদিনই কারিগরী ক্ষেত্রে স্বয়ংনির্ভরতা আসবে না।

১। মানবজ্ঞানের সাধারণ ভাণ্ডার, জানা কারিগরি, উপস্থিত ও চালু যন্ত্র, প্লান্ট, কারখানা, প্রক্রিয়া, নকশা ও ছক ব্যবহার করে, দরকার মতো উদ্ভাবন, নকল ও মানানসই করে দেশজ কারিগরি সৃষ্টিকেই কারিগরী নীতির চাবিকাঠি হিসাবে স্থান দিতে হবে।

২। দেশজ কারিগরির উন্মেষ ঘটছে, তা যত ধীরে ও খাপছাড়াভাবেই হোক না কেন, এমন সমস্ত ক্ষেত্রে কারিগরি আমদানি নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩। বোতাম টেপা, মোড়কে মোড়া ও অন্য সব ধরনের পরোক্ষ আমদানি বন্ধ করতে হবে। বিদেশী মুদ্রা তহবিলের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব উদ্বৃত্তের সিংহভাগ দিয়ে সরাসরিভাবে কিনতে হবে সযত্নে বাছা এমন

কিছু মৌলিক নকশা, ছক, প্লান্ট ও প্রক্রিয়ার কারিগরী জ্ঞান যা শিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিতে কারিগরী জটগুলি খুলে দিতে পারে।

এই ধরনের কোনও কারিগরী নীতি কার্যকরী হতে পারে কেবল যদি বিদেশী সাহায্যের উপর আমাদের অগ্রগতিকে নির্ভরশীল রাখার নীতি পরিপূর্ণভাবে বর্জিত হয়, কারণ কারিগরি আমদানির অনেকটাই আসে ঐ সাহায্যের সঙ্গেই এক মোড়কে মোড়া হয়ে। বলাই বাহুল্য, এ ছাড়া বড় পুঁজিপতি ও বিদেশী পুঁজির দুষ্টচক্রটীও কড়া হাতে ভেঙে দিতে হবে।

এ ধরনের আমুল নীতিবদল ছাড়াই, পূর্ব ইয়োরোপের সাহায্যের উপর বেশী জোর দিলেই শিল্প স্বয়ং নির্ভরতার পথে চলবে, এমন তরল তত্ত্বে যদি কোনও সরকার আস্থা রাখেন, তবে তাকে গত কয়েক বছরের ইতিহাস কিছুই শেখাতে পারে নি।

গ্রন্থপঞ্জী

১। Foreign Technology in India, V. P. Chitale, Economic and Scientific Research Foundation, New Delhi, Dec. 1973.

২। Foreign Technology and Investment, National Council of Applied Economic Research, New Delhi, June 1971.

৩। Michael Kidron, Foreign Investments in India, Oxford University Press, 1965.

৪। M. Sebastian Stanislaus, Soviet Economic Aid to India, N. V. Publications, New Delhi, 1975.

৫। Foreign Collaborations : 1957—1964, Research Bureau, The Economic Times, in Foreign Collaboration : Report and Proceedings of the Seminar by the Centre of Advanced Studies, University of Bombay, ed. R. K. Hazari, 1967.

৬। Foreign Collaboration in Indian Industry, Survey and Report, Reserve Bank of India, 1968.

৭। The Statesman, 11. 2. 78 ; Report dt. 31. 1. 77.

৮। Foreign Financial Collaborations in the Private Sector, K. K. Subrahmaniam, in Foreign Collaborations ed. R. K. Hazari, 1967.

৯। 40th Report, 1973-74, 5th Loke Sabha : Role and Achievements of Public Undertakings.

১০। Deepak Lal, Appraising Foreign Investment in Developing Countries, Heinemann, 1975

১১। International Seminaron Technology Transfer, CSIR, 11-13 Dec,, 1972, New Delhi, Vol. I.

(ক) Transfer of Technology between Developing Countries, G.S. Ramaswamy, Director, Structural Engineering Researeh Centre, Madras.

(খ) Technology Transfer in Industrialisation of Developing Nations, I. K. Puri, Director, Invention Promotion Board, New Delhi·

(গ) Rationale and Methodology of Industrial Research and its Transfer to Industry, B. D. Tilak, National Chemical Laboratory.

(ঘ) Role of R & D in Transfer of Technology, D. Banerjee.

(ঙ) From Laboratory Reseach to Industrial Production, some case studies, G. S. Sidhu and G. S, Rao, Regional Research Laboratory, Hyderabad.

১২। Padma Desai, The Bokaro Steel Plant, North Holland, 1972.

১৩। Asha L. Datar, India's Economic Relations with the USSR and East Europe, 1972.

['বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর তরফ থেকে এই প্রবন্ধ রচনার ভার পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার কয়েকজন সদস্য বন্ধুর ওপর দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী ও সংস্থার সম্পাদক হিরণ্ময় সাহা এই সমীক্ষাটি রচনার মূল দায়িত্ব বহন করেছেন।]

Reorganisation of CSIR

[A few months back the Government of India declared that the C S I R would be reorganised by linking the various C S I R laboratories directly with the respective user ministries. The Scientific Workers' Forum, West Bengal, organised a seminar in order to collect opinions from the scientific workers' community on this issue. A report of the seminar, along with an article analysing the various opinions for and against the proposed reorganisation, was published in the Nov.-Dec. issue of this bulletin. Since then the Government has decided not to give effect to the originally declared programme in full. Hence the issue of reorganisation of C S I R may be said to have remained open till now. In view of this, opinions of different individuals and scientific associations and other bodies on this question will be published in this bulletin in the present and forthcoming issues. We reproduce below a resolution adopted by the Andhra Pradesh Akademy of Sciences in September, 1977 in response to the original declaration from the Government. This will give us an idea of the views held by at least one section of the scientific workers' community. This may not represent the consensus among the scientific workers in our country, but we hope that through an intensive exchange of ideas such a consensus may be formed in near future. This resolution along with some other related documents has been kindly sent to us by Dr. Indra Dev from the Administrative Staff College of India, Hyderabad. A letter (in Bengali) sent by a reader on the state of research in laboratories linked directly to the ministries is also being published in this issue]

Andhra Pradesh Akademy of Sciences

The Andhra Pradesh Akademi of Sciences has considered the matter relating to the organisation of scientific research on September 6, 1977 and view the present action of the Government here in the context of the excellent and dedicated work that has been done by the C S I R during the last 3 decades. The Akademy felt that the decisions like this involving the 42 scientific laboratories and nearly 11,000 workers should have been taken after taking into confidence the scientific community and in consultation of the senior scientists of the Government. However, Akademi cautions that scientific work in the present-day context should be related to rural development which is the prime objective of the present-day Government. The scientific research laboratories should frame their policies and programmes based on the needs of the Government and better involve the Government officials in framing them.

স্বাধীন ভারতবর্ষে ঔষধশিল্প ও তার সমস্যা

খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের পরেই মানুষের চাহিদা ওষুধের, চিকিৎসার উপকরণ হিসাবে। স্বাধীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার না কি অনেক উন্নতি হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ নিজ ক্ষমতায় নাকি একটা প্রধান স্থান দখল করেছে। কিন্তু এটা কি ঠিক নয় যে আজও ভারতবর্ষে ওষুধের অভাবে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়? 'দেশ এগিয়ে চলেছে' 'অনুশাসন দেশকে বড় করে'—এভাবে অনেক শ্লোগান আমরা উপহার পেয়েছি। স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পর 'গরীব,' কথাটা বলতে লজ্জিত হয়ে আমরা বলি 'সমাজের দুর্বলতর অংশ'। কিন্তু সমস্যার তাতে সমাধান হয় নি। এই 'দুর্বলতর অংশের' একটা বড় অংশ রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ কেনার ক্ষমতা না থাকায় শহরে ফুটপাথে বা বস্তিতে রোগযন্ত্রণা ভোগ করে, গ্রামে হাতুড়ে ডাক্তার বা তুকতাকের আশ্রয় নেয়। নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘরে অসুখে হয়তো ডাক্তার আসে, ওষুধের জন্য পয়সা খরচ করা হয়, মাসিক আয়ের একটা মোটা অংশ ওষুধের দামে বেরিয়ে যায়। ফলস্বরূপ একটা রোগের নিরাময় হয়ে আর একটা রোগ বাধে—সেটা হয়ত খাদ্যাভাব থেকে, দেহের প্রয়োজনীয় ক্যালরি না জোটাতে পারার জন্য। উচ্চবিত্তের ঘরে অন্য ঘটনা—সেখানে বাড়ীর ছোট ছেলে একগাদা বিলিতি গাড়ীর আর ঔষধের নাম ফড়ফড় করে বলে দেয়—গর্বিত বাবা-মা বলেন ছেলে বড় হয়ে ডাক্তার হবে (গাড়ীও হবে)। সামর্থ্য থাকলে ক্রেতা বিদেশী কোম্পানীর ওষুধ কেনার চেষ্টা করে। ফার্মাসীতে বিদেশী কোম্পানীর ওষুধের ছড়াছড়ি—নয়নশোভন বোতলে, সুন্দর লেবেল আটা, তার পাশে অনেক সময় একটি দেশী কোম্পানীর ওষুধকে মনে হয় সৎ ছেলের মত, আধার জীর্ণ, মুখের প্যাঁচ কাটতে গিয়ে বোতল ভেঙ্গে যায়, লেবেলের আঠা উঠে আসে। ডাক্তাররাও চিকিৎসা পত্রে বিদেশী ওষুধের গালভরা নাম লিখে দেন। কিন্তু দামের ত' ফারাক অনেক। প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি দেশী ওষুধে কাজ হয় না? হয়ত' একেবারে অসত্য নয়। মূল উপাদান এক হলেও প্রতিটি ওষুধেরই কিছু কিছু গুণগত উপকরণ থাকতে হয়, যার অভাবে ঔষধের ফলপ্রসূতা সময়, তাপ ও কিছু প্রাকৃতিক আবহাওয়ার প্রভাবে কমে যেতে পারে। কিন্তু তা কাটিয়ে ওঠার উপায় আছে এবং যে কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানই (দেশী হোক, বিদেশী হোক) ওষুধের গুণগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার দিকে কমবেশী যথেষ্ট নজর দেয়। দেশী ওষুধশিল্প অবহেলিত হওয়ার মূল কারণটা কিন্তু অন্য জায়গায়। এটা বুঝতে হলে ভারতবর্ষের ওষুধশিল্পের কাঠামো সম্বন্ধে কিছু জানতে হবে।

অন্য অনেক দেশের মতই ভারতবর্ষের ওষুধ শিল্পের অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্যগুলো হল (১) মুনাফালাভের তাগিদ (২) একচেটিয়া ব্যবসা (৩) বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুপ্রবেশ ও প্রাধান্য এবং (৪) জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর গৌণ ভূমিকা। ওষুধ কোম্পানীগুলো ওদের ভাষায় 'ন্যায্য লাভের' মাত্রা রেখে ওষুধ বিক্রি করে। লোকের ক্রয়ক্ষমতার সংগে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। গড়ে একজন ভারতীয় বছরে ওষুধ কেনার জন্য মাত্র পাঁচ থেকে ছয় টাকা খরচ করে, কিন্তু এই সংখ্যা থেকে সঠিক চিত্র বোঝা যায় না। আমাদের লোকসংখ্যার প্রায় আশী ভাগ কোন চিকিৎসারই সুযোগ পান না। ১৯৭৩ সালে লোকসংখ্যার মাত্র কুড়ি শতাংশ মোট ওষুধের শতকরা আশীভাগ ক্রয় করেছেন, আর বাকী আশী শতাংশ লোক কিনেছেন মাত্র কুড়িভাগ। পৃথিবীর অন্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এবং ভারতবর্ষে এই শিল্পের ছবি মূলগতভাবে একই, উৎপাদনের পরিমাণ চাহিদাভিত্তিক, প্রয়োজনীয়তাভিত্তিক নয়। যেমন কালাজ্বরের সাম্প্রতিক প্রকোপে এই প্রায়বিলুপ্ত রোগটির প্রতিষেধক তৈরী করতে হলে কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তা তৈরী করতে চাইবে না, কারণ এর চাহিদা বর্তমানে সামান্য ও সাময়িক, যদিও প্রয়োজনীয়। কাজেই বুঝতে পারা যায়, এই কোম্পানীগুলোর ব্যবসার সংগে সামাজিক দায়িত্বপালনের কোন সম্পর্ক নেই। একমাত্র বিবেচ্য হচ্ছে মুনাফালাভ, পৃথিবীব্যাপী প্রধান প্রধান ঔষধশিল্পের রূপ পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে উন্নত ধনতান্ত্রিক ও উন্নতিকামী দেশগুলিতে গুটিকয়েক বহুজাতিক কোম্পানীরই প্রাধান্য, যার ফল হলো একচেটিয়া ব্যবসা।

ভারতবর্ষের শিল্পকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) সরকারী (২) দেশী বেসরকারী ও (৩) বিদেশী। একশোটী সংগঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ৩টি সরকারী। মোট ৩৭০ কোটী টাকা পরিমাণে উৎপাদনের মধ্যে প্রায় ২৯৬ কোটী টাকা মূল্যের ওষুধ উৎপাদন করে ১১০টি একচেটিয়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। পূর্ণ উৎপাদনের ৪০ শতাংশ তৈরী করে মাত্র ২৮টি বিদেশী কোম্পানী। লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে বেসিক ড্রাগের (Basic Drug) বেশীর ভাগই উৎপাদিত হয় সরকারী কারখানায়। অন্যদিকে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো আমদানীকৃত আধাপ্রস্তুত রাসায়নিক (intermediate product) থেকে একই জিনিস তৈরী করে।

আগেই বলা হয়েছে যে এই শিল্পে মুনাফালাভ হচ্ছে একটা অপরিহার্য্য অংশ। গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান দেখলে বিষয়টা

অনুধাবন করা সহজ হবে। যদিও গত কয়েকবছর ধরে মুনাফালাভের মান বহুবিধ শিল্পোদ্যোগেই নিম্নগামী ছিল এবং ওষুধ শিল্পও তার ব্যতিক্রম নয়, তথাপি দেখা যায় যে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে এই ক্রমাবনতির মান নগণ্য। লভ্যাংশের হ্রাসটা প্রধানভাবে পরিলক্ষিত হয় দেশী প্রতিষ্ঠানের বেলায় (নিম্নলিখিত ছক দ্রষ্টব্য)।

ঔষধ-শিল্পে লভ্যাংশের পরিমাণ : ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩
(ইকনমিক টাইমস্ থেকে উদ্ধৃত)

	মোট বিক্রীর অনুপাতে মোট লাভ		মোট বিনিয়োগের অনুপাতে মোট লাভ	
	১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩	১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩
বিদেশী কোম্পানী	১৮·৪	১৭·৫	২৪·৩	২৪·২
দেশী কোম্পানী	১৬·৫	৮·১	১৪·২	৯·৪

দেখা যাচ্ছে যে '৭১-'৭২ সাল থেকে '৭২-'৭৩ সালে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর লভ্যাংশের হ্রাস খুবই কম অথচ দেশী কোম্পানীগুলোর লভ্যাংশ এই সময়ে যথেষ্ট কমে গেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে, ১৯৬৬ সালে বিক্রয়ের পরিমাণের বিচারে প্রথম ১৫টি কোম্পানীর মধ্যে মাত্র ৪টি ছিল দেশী প্রতিষ্ঠান, আর ৩৯টি বৃহৎ ও মধ্যম শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৩টিই ছিল বিদেশী, ১৯৬৯-৭০ সালে উপরোক্ত ৩৩টি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ লাভের পরিমাণ ছিল মোট লাভের ৯৩ শতাংশ। অনেক সময় দেখা যায়, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন-ক্ষমতা বেশী থাকলেও জনসাধারণের স্বার্থে তারা তাদের ক্ষমতার পুরোপুরি ব্যবহার করে না—উৎপাদন কমিয়ে রাখে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-গুলোর সাথে সমঝোতার মাধ্যমে ঘৃণ্য উপায়ে কোন কোন ঔষুধের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, উৎপাদন সীমিত রাখে এবং জনসাধারণের ন্যায্য চাহিদাকে উপেক্ষা করে। বিদেশী পুঁজিপতিদের প্রাধান্য অবশ্য আন্ত-র্জাতিক ক্ষেত্রেও ওষুধ শিল্পের স্বাভাবিক পরিস্থিতি। উন্নত দেশগুলিতেও তাদের মুনাফার অভাব হয় না। কিছু তথ্য জানালে প্রকৃত অবস্থার মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। সব দেশেই তাদের স্বার্থ রক্ষা করে জন-সাধারণের কাছ থেকে সুবিধাভোগী কিছু অংশ তথাকথিত জনপ্রতিনিধি রাজনীতিবিদেরা। রাজনীতিতে এইসব প্রতিষ্ঠানের জোরালো 'লবি' থাকে, যাতে কায়েমী স্বার্থ যথার্থভাবে রক্ষিত হয়। জাতীয় শিল্পের উন্নতি তাতে বিঘ্নিত হয়। প্রসংগক্রমে একটা বিশেষ ঘটনার উপর আলোকপাত করা যেতে পারে। ইকনমিক টাইমসে প্রকাশিত খবর ('Mystery shrouds grant of license'), একটি বিদেশী ফার্ম 'C. F. Fulford'কে জেন্টামাইসিন সালফেট তৈরীর জন্য দু কোটী টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়। অনেক টালবাহানার পর তদানীন্তন পেট্রোলিয়াম ও কেমিকাল সংক্রান্ত মন্ত্রী শ্রী কে. ডি. গণেশএর অসুস্থতার দরুণ অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অনুমোদন কমিটীর বিশেষ সভায় লাইসেন্সটা মঞ্জুর করা হয়। ষ্টেট ট্রেডিং করপোরেশনেও বিদেশী 'লবির' চাপে অনেক সময় জাতীয়তা বিরোধী সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কোন বিশেষ ওষুধের মৌলিক উপকরণ হয়ত STCর ষ্টকএ জমা হয়ে আছে। অথচ বিদেশী কোম্পানীগুলোর চাপে তা আমদানি করা হয়। জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী মনোভাব বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সব সময়েই বহন করে।

বহুজাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মুখপাত্রের বক্তব্য

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organisation) মুখ্য পরিচালক ডঃ এইচ মাহলার এক সাক্ষাৎকারে দরিদ্র দেশগুলাতে বহুজাতিক ওষুধের কোম্পানীগুলোর কার্য-কলাপের নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে এই কোম্পানীগুলো ব্যবসায়ী প্রচারের মাধ্যমে যে সমস্ত ওষুধ বাজারে বিক্রী করে জনসাধারণের প্রয়োজনের নিরিখে তার শতকরা ৯৮%-ই অপ্রয়োজনীয়। এরা বাজারে যত রকম ওষুধ বিক্রী করে তার মাত্র ২% শতকরা ৯০% ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় (ষ্টেটসম্যান ২৬।২।৭৮)। অর্থাৎ যে পরিমাণ সম্পদ বিভিন্ন ধরনের ওষুধ তৈরীর ক্ষেত্রে নিযুক্ত হয় তার অধিকাংশই ব্যবসায়ী স্বার্থে অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যবহৃত হ'চ্ছে।

যে কোন ওষুধের প্রধান উপকরণ এক বা ততোধিক রাসায়নিক দ্রব্য। ওষুধ শিল্পগুলি বেশীর ভাগ সময়ই অন্যান্য প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মিশিয়ে একটা বিশেষ 'ব্র্যাণ্ড' নামে বাজারে ছাড়ে, তাতে মূল্য-বৃদ্ধির সুযোগ পাওয়া যায় এবং মুনাফা লাভের সুযোগ হয়। চিকিৎসায় কোন ওষুধের উপকারিতা বেশী হবে তা চিকিৎসকই নির্ধারণ করেন। কিন্তু তাঁর বিবেচনা সব সময় যে যুক্তিনির্ভর তা নয়। আমাদের দেশে প্রতিটী ওষুধের ফলপ্রসূতা সম্বন্ধে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ণ করার পদ্ধতি নেই—বিশেষতঃ একই উপকরণযুক্ত বিভিন্ন নামধারী ড্রাগগুলির। অনেক সময় এই নির্বাচন করা হয় কোম্পানীগুলোর মাহিনাভুক্ত সেলসম্যান এর কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রচারপত্রের উপর নির্ভর করে। এই পত্রগুলি নিতান্তই প্রচারমূলক এবং সেগুলোতে পুরো তথ্য খোলাখুলিভাবে না থাকা অস্বাভাবিক নয়। মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভ্ নামক একটি বিত্তভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচারের অঙ্গ হিসেবে। দেশী কোম্পানীগুলো অর্থাভাবে প্রচারের এই পথকে সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারে না। বহুজাতিক ড্রাগশিল্পগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যদিও অনেক ওষুধের ওরা বিক্রেতা তথাপি অনেক সময় মূল লভ্যাংশ আসে একটি, দু'টি বা কতিপয় বিশেষ ওষুধের বিক্রী থেকে। উদাহরণস্বরূপ

বলা যেতে পারে হফম্যান-লা-রোশের 'লিব্রিয়াম', এই ওষুধটি মানসিক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এবং সমগ্র বিশ্বেই বহুজন-সমাদৃত। আমেরিকাতে দেখা গেছে, সমস্ত দেশে ডাক্তারদের চিকিৎসাপত্রে অনুমোদিত ওষুধের চার শতাংশ হল 'লিব্রিয়াম' ও 'ভ্যালিয়াম'। পশ্চিমের বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে সাধারণ মানুষের জীবন যথেষ্ট জটিল হয়ে পড়ায় মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। তাই এই দুটি ঔষধের প্রয়োজনীয়তা যুক্তি সংগত। কিন্তু বহুজাতিক 'লা রোশ' এই ওষুধ থেকে কিভাবে মুনাফা অর্জন করছে দেখুন— দেমোয়ান্স-এ লিব্রিয়ামএর দাম কেজি প্রতি ৪৫ ডলার অথচ ফিলাডেলফিয়ায় তার দাম মাত্র ২১.৭৫ ডলার। ভারতবর্ষে বাজারে এর দাম গড়ে কেজি প্রতি ৫,৫৫৫ টাকা, অথচ দিল্লীর একটা ফার্ম আমদানী করছিল মাত্র ৩১২ টাকা কেজিতে।

অনেকে এই ধারণা পোষণ করেন যে বিদেশী কোম্পানীগুলোর বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ফলে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত বহু মূল্যবান ওষুধ তৈরী হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগার-গুলিতে একইভাবে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে এই ধারণা কিন্তু ভুল। তাই যদি হত তা হলে আমাদের দেশে ওষুধের মূল্য উত্তরোত্তর কমে যেত, সাধারণ লোকের বিরাট অংশ চিকিৎসার উপকরণ পেত। নজর করলে দেখবেন, কেবল ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর বহু দেশের বিজ্ঞানীরাই সময় কাটাচ্ছেন 'molecule manipulation' করে। তাতে একটা প্রয়োজনীয় ওষুধের রাসায়নিক কাঠামোর হয়ত কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু কর্মক্ষমতা নাও বাড়তে পারে। কিন্তু যেহেতু বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফা লাভের একটা উপায় হল 'gimmick' দেওয়া তাই বাজারে নতুন নামে আর একটা ওষুধের আগমন হয়। তার বিক্রয়ের জন্য প্রচুর পয়সা খরচ হয়, সেলসম্যান নিযুক্ত হয়, সুখপাঠ্য প্রচার পত্র তৈরী হয়, তাতে অনেক মনোহরণকারী পরিসংখ্যানের অন্তর্ভুক্তি হয়, ডাক্তাররা এই প্যামফলেটের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এই ওষুধের প্রচলন শুরু করেন। তাতে মুনাফার অংশ আরো বেড়ে চলে।

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যপ্রণালীর আর একটা দিক দেখা যাক। ইউরোপ ও আমেরিকাতে অনেক 'জীবন রক্ষণকারী ওষুধ' আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে পশ্চিমী দেশগুলির অগ্রগতি অনস্বীকার্য কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুন্নত দেশগুলিতে এ সংক্রান্ত কারিগরির আমদানি হয়েছে অনেক পরে। যদি বিজ্ঞানসম্মত আবিষ্কারের ফল সমগ্র মানব-জাতির জন্য হয় তবে তার প্রয়োগ অনুন্নত দেশে এত দেরীতে হল কেন? কয়েকটা ছোট দৃষ্টান্ত থেকে বিষয়টি আরো পরিস্কার হবে।

ওষুধের তালিকা / বিদেশে উৎপাদনের তারিখ / ভারতবর্ষে উৎপাদনের তা:

১. পেনিসিলিন ৬	১৯৪১	১৯৫৫
২. অ্যাম্পিসিলিন	১৯৬১	এখনও হয়নি
৩. ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন	১৯৪৭	১৯৬৩
৪. টলবিউটামাইড	১৯৫৬	১৯৬০

ভারতবর্ষে বহুজাতিক ঔষধশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা সাধারণ মানুষের চাহিদার পরিপন্থী। উঁচুমানের ঔষধ উৎপাদন, গবেষণার জন্য অপর্য্যাপ্ত খরচ, শিল্পে উন্নত ধরণের প্রক্রিয়ার ব্যবহার এ সবই হয়ত কিছুটা সত্য কিন্তু তাতে কি ভারতবর্ষে শতকরা আশীভাগ গরীব লোকের সুরাহা হচ্ছে? যদি বলা হয়, ওষুধের উৎপাদনের ভূমিকা সরকার রাষ্ট্রায়ত্ব করুক তা হলেই কি সম্পূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান হবে? কারণ মূল ওষুধের প্রকরণ তৈরী করার পরেও ত' বহু কোম্পানী তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী 'ফরমুলেশন' করে ওষুধ বাজারে ছাড়ছে। এর জন্য উৎপাদন ছাড়াও সাধারণ মানুষের কাছে ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার ভারও সরকারের হাতে আসতে হবে।

ঔষধশিল্পকে কি উপায়ে জনসাধারণের যথার্থ সেবায় নিয়োজিত করা যেতে পারে তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। এই শিল্পে কি পরিমাণে ব্যবসায়িক স্বার্থের প্রাধান্য র'য়েছে তা নিয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। এ বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আর বিশদ আলোচনা হলে আমাদের দেশের বিজ্ঞান-কর্মীরা জাতীয় স্বার্থে ঔষধশিল্পকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে পারবেন।

সংবাদ

শিক্ষাক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্র

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর আগের কয়েকটা সংখ্যায় আমরা বিভিন্ন বেসরকারী কলেজে কয়েকজন বিজ্ঞান শিক্ষকের কর্মচ্যুতি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। আনন্দের সঙ্গে জানানো হচ্ছে যে নেতাজীনগর কলেজ সরকার অধিগ্রহণ করেছেন ও সেই কলেজের কর্মচ্যুত অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী পুনরায় কাজে যোগ দিয়েছেন। বিড়লা কলেজ অফ সায়েন্স এণ্ড এডুকেশনের বিষয়েও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে প্রশংসনীয় উদ্যম দেখা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কলেজ কর্তৃপক্ষ আর কর্মচ্যুত দুজন অধ্যাপক উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে ১০।২।৭৮ তারিখে স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছেন যে ঐ দুজন অধ্যাপককে বরখাস্ত করার যে আদেশ কলেজ কর্তৃপক্ষ দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় তা নাকচ করে দিচ্ছেন। তিনি ঐ দুই অধ্যাপককে কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে (এই পত্রিকার জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী সংখ্যা দ্রষ্টব্য) অধ্যাপক দুজন বরখাস্ত হয়েছিলেন উপাচার্য নিজে তা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে তা ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন (সূত্র : উপাচার্যের ১০।২।৭৮ তারিখের নির্দেশনামা)। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফের স্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও কলেজ কর্তৃপক্ষ হয়তো তাদের একচেটিয়া আর্থিক শক্তির দম্ভেই এই ঘোষণাকে উপেক্ষা করে চলেছে। স্বৈরতন্ত্র বজায় রয়েছে, অধ্যাপকদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হয় নি।

নিখোঁজ বিজ্ঞানী

পরমাণু শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানী শ্রীস্বপন সরকার ১৯৭৩ সালের ২৪শে অক্টোবর টুরামডি জিওলজিক্যাল ক্যাম্প থেকে নিখোঁজ হন। আজও পর্য্যন্ত এই তরুণ বিজ্ঞানীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। শ্রীসরকার পরমাণু শক্তি কমিশনের পরমাণু খনিজ বিভাগের টুরামডি জিওলজিক্যাল ক্যাম্পে সায়েন্টিফিক অফিসার গ্রেড 'এসসি ওয়ান' পদে আসীন ছিলেন। তিনি ছিলেন পরমাণু খনিজ বিভাগের একজন সেডিমেন্-টেশন্ বিশেষজ্ঞ। ১৯৭৩ সালের ১৪ই অক্টোবর কুমারডুবীতে তিনি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে এক মাসের ছুটি কাটিয়ে টুরামডিতে এসে কাজে যোগ দেন। শ্রীসরকার ১৯৭৩ সালের ২০শে অক্টোবর তাঁর বাবাকে চিঠিতে জানান যে তিনি টুরামডি থেকে নাগপুরে বদলি হয়ে যেতে পারেন এবং নাগপুরে যাওয়ার আগে তিনি কুমারডুবীতে যাবেন। তাঁর স্ত্রীর কাছে তিনি ১৯৭৩ সালের ২৩শে অক্টোবরের লেখা চিঠিতে জানান যে তিনি হয়তো অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে সোজা নাগপুর চলে যাবেন। শ্রীসরকারের আর কোন খোঁজ খবর না পেয়ে ১৯৭৩ সালের ১১ই নভেম্বর তাঁরা খোঁজ করলে টুরামডি অফিস থেকে জানানো হয় যে শ্রীসরকার দুদিনের ক্যাজুয়াল সহ কয়েক দিনের বেশি ছুটি নিয়ে ১৯৭৩ সালের ২৪শে অক্টোবর বিকালে টুয়ামডি ছেড়ে গেছেন যাতে করে তিনি ৩০শে অক্টোবর কাজে ফিরে নাগপুর রওনা হতে পারেন। পরে জানা যায় টুরামডি ক্যাম্পের অফিসার-ইন-চার্জ মিঃ সিরকা তাঁকে বেলা ১১·৩০ মিনিটে সাকচি ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে অফিস জিপে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসেন। সেই থেকে শ্রীসরকারের কোন খোঁজ খবর আর পাওয়া যায়নি। শ্রীসরকারের পরিবারবর্গ জামশেদপুরে আটটি পুলিশ ষ্টেশনে ডায়েরী করেন, প্রসঙ্গত টুরামডি ক্যাম্পের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ পুলিশ স্টেশনে ডায়েরী করেননি। ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ সহ শ্রীসরকারের স্ত্রী তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী, পরমাণু শক্তি কমিশনের ডিরেক্টর ও কয়েকজন সংসদ সদস্যকে জানান। এই বিষয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সংবাদ আকারে ও সম্পাদকীয় কলমে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ৩৬শে এপ্রিলরাজ্য সভার বিরোধী দলের সদস্যরা প্রশ্নটি উত্থাপন করলে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে. সি. পন্থ এই আশ্বাস দেন যে বিহার সরকার চাইলে অনুসন্ধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সব রকমের সাহায্য দিতে প্রস্তুত।

এই সব চেষ্টা সত্ত্বেও এই বিষয়ে আশানুরূপ কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না এবং শ্রীসরকারের আত্মীয়স্বজনের এই ধারণা হয়েছে যে বিহার পুলিশ অনুসন্ধান কার্যে আশানুরূপ উৎসাহ প্রকাশ করেনি। ফলে তাঁরা এ ব্যাপারে যে তিমিরে ছিলেন আজও সেই তিমিরেই আছেন। দেশের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীদের স্বার্থে শ্রীসরকারের সন্ধানের জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালানো অবশ্য কর্তব্য। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিহার রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মহলে এই অনুসন্ধান ত্বরান্বিত করার দাবী জানানো হয়েছে। সরকারী মহল সেই মর্মে আশ্বাস জানিয়ে উত্তরও দিয়েছেন কিন্তু আশ্বাসকে কাজে পরিণত করার লক্ষণ এখনও দেখা যায় নি।

['বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় CSIR এর প্রস্তাবিত পুনর্গঠন বিষয়ে যে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছিল সে প্রসঙ্গে নিচের চিঠিটি প্রকাশ করা হলো। পত্রদাতা সরকারী মন্ত্রকের অধীনে রসায়নশিল্পের এক প্রতিষ্ঠানের কর্মী। সরকারী মন্ত্রকের অধীন এই সব প্রতিষ্ঠানে গবেষণার পরিস্থিতি কি, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে সেটা এখানে তুলে ধরেছেন]

C. S. I. R.-র পুনর্বিন্যাস প্রসঙ্গে

CSIR এর পুনর্বিন্যাস প্রসঙ্গে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর' তৃতীয় সংকলনে যে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হবে ভেবে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত একটি গবেষণাগারের অভিজ্ঞতা তুলে ধরছি। যেহেতু CSIR এর পুনর্গঠনের একটি মূল কারণ হিসাবে ব্যবহারকারী মন্ত্রকগুলোর সঙ্গে গবেষণাগারের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে সেহেতু যেখানে এই ধরনের নিবিড়তম সম্পর্ক রয়েছে সেখানে ফলাফল কি হয়েছে তা তুলে ধরলে এই ধরনের 'সদিচ্ছার' একটি বাস্তবসম্মত বিচার সম্ভব হবে।

হালে সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী সরকারী ও বেসরকারী বহু বৃহৎ সংস্থাই কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য শিল্পসংস্থার পরিচালনায় এক একটি আধুনিক গবেষণাগার গড়ে তুলেছেন। শিল্পের কলাকৌশল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগতভাবে এই সংস্থাগুলির বিশেষ সুবিধা রয়েছে। 'Relevance of research' বলে বহু আলোচিত যে জিনিষটির অভাব বিশ্ববিদ্যালয় অথবা স্বয়ংশাসিত গবেষণাগারগুলিকে লক্ষ্যহীন করে তোলে এখানে অনেক সহজেই তাকে বাস্তবায়িত করা যায়। নির্দিষ্ট তাগিদের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা স্বয়ংশাসিত গবেষণাগারগুলির ক্ষেত্রে বিশ্বের অনন্ত সমস্যার মধ্যে একটি প্রাসঙ্গিক দিক খুঁজে কার্য্যকরী ফল লাভ খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিযোগিতার বাজারে একটি শিল্পসংস্থা অনেক সহজে বেছে নিতে পারে কলাকৌশলের কোন দিকে বিকাশ সাধন তাকে একটি লাভবান সংস্থা হিসেবে টিকিয়ে রাখতে পারে। এহেন সংস্থার অন্তর্ভুক্ত গবেষণাগারের ক্ষেত্র নির্বাচন অনেক স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট। নানা পেশার নানা স্তরের কর্মীদের সার্থক সমন্বয়ে যে উৎপাদন গড়ে ওঠে তাই গবেষণার ক্ষেত্রে নানা বিষয়ে বিজ্ঞানী ও কারিগরের যৌথ প্রয়াসকে সহজতর করে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অর্থের কোন অকুলান ঘটে নি। সরকারের ট্যাক্স রিলিফ, বিজ্ঞান, ও কারিগরি মন্ত্রকের উদার অর্থ বিতরণ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কলেবর যথেষ্ট স্ফীতকায় করে তুলেছে। আধুনিক গবেষণায় অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত দামী দামী যন্ত্রপাতি আমদানির সঙ্গে বিজ্ঞান ও কারিগরির নানা বিভাগের বিজ্ঞানীদের নিয়োগ করা হয়েছে। যোগাযোগের জন্য গড়ে উঠেছে নানা কমিটি। কিন্তু এই বিরাট প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি কি ?

একটি সংস্থার কিছু অভিজ্ঞতা নিয়েই বলতে পারি, গবেষক জানেন না তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তুর নির্বাচনের পিছনে কোন পরিকল্পনা কাজ করছে এবং এর পরিণতিই বা কি ঘটবে ? অর্থাৎ সেই একই উদ্দেশ্যহীনতা। আলাপ আলোচনায় দেখেছি এটা এক ব্যতিক্রম তো নয়ই বরঞ্চ খুবই সাধারণ অভিজ্ঞতা। বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য রসায়নশিল্পে গবেষণার ধরণটি বিশদভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

সাধারণতঃ সমস্ত শিল্পেই এক একটি ল্যাবরেটরী থাকে যেখানে যে নানা স্তরের মধ্য দিয়ে কোন বস্তুর উৎপাদন হয় সেই স্তরগুলি ঠিক ঠিক নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও উৎপাদিত বস্তুর গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়। সমস্ত স্তরগুলি ও উৎপাদিত বস্তুটি সুপরিচিত থাকায় বিশ্লেষণের কাজটি একটি রুটিন কাজের পর্য্যায়ে পড়ে। যদিও এখানেও উন্নতি করার প্রচুর সুযোগ থাকে তবু এই ধরনের কাজগুলিকে গবেষণা বলা যায় না।

রাসায়নিকশিল্পে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক, সেই সমস্ত গবেষণা যা উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন না ঘটিয়ে বা উৎপাদিত বস্তুটির পরিবর্তন না এনেও প্রচলিত পদ্ধতির নানা ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন ঘটিয়ে অথবা শিল্পের উপজাত বস্তুগুলিকে কাজে লাগিয়ে শিল্পকে লাভবান করে থাকে। দুই, যে গবেষণা উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে উৎপাদিত বস্তুকে সুলভ করে তোলে অথবা নতুন গুণসম্পন্ন বস্তুর উদ্ভাবন ঘটিয়ে তাকে জনপ্রিয় করে তোলে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি সরকারী শিল্পের গবেষণাগার-গুলিতে যে প্রকল্পগুলি নেওয়া হয় তা প্রথমোক্ত ভাগেই পড়ে। বহু বিষয়ে উন্নতির সুযোগের মধ্যে কয়েকটি বিষয় নির্বাচনের মধ্যে সুচিন্তিত কোন দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা কাজ করে না, বরঞ্চ খাপছাড়াভাবে কয়েকটি নিয়ে কাজ শুরু করায় প্রবণতাই থাকে বেশী। আবার গবেষণাকে সার্থক করে তোলার জন্য ধাপে ধাপে তার উন্নতির জন্য যে কার্যসূচী থাকা

দরকার তার বদলে থাকে দ্রুত সাফল্য লাভ করার এক অস্থির মানসিকতা। প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা ও পথ কোনটাই ঠিকমত যাচাই না করে সাফল্যের রেকর্ড সৃষ্টি করতে গিয়ে প্রকল্প বেশিদূর এগুতে পারে না। অতএব কিছুদিনের মধ্যেই সেই প্রকল্পগুলির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে কাগজেকলমে তার অস্তিত্ব বজায় রাখা হয়, যদিও ল্যাবরেটরীর বাৎসরিক অথবা মাসিক রিপোর্টে তা রঙীন হয়ে ওঠে। আবার শিল্পে স্বতস্ফূর্তভাবে নানা সময়ে নানা প্রয়োজন জরুরী হিসাবে দেখা দেয়, অথবা উপর থেকেও নানা কর্মসূচীর তাগিদ আসে। তখন তাড়াহুড়ো করে একটি পরিকল্পনাকে মাঝপথে ছেড়ে অন্যটিকে হাতে নেওয়া হয়। এহেন একটি পরিস্থিতির জন্য শেষ পর্যন্ত রিপোর্টের তালিকায় দীর্ঘ কর্মসূচী থাকলেও কোন একটিও কার্য্যকরী হয়ে উঠতে পারে না। আর Central Reserch & Development Laboratoty-গুলি বিরাট সৌধ ও চকচকে আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে showpiece হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্যদিকে management, শিল্পে উন্নত দেশগুলির নানা প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সাহায্যের চুক্তি করতে থাকেন।

এত সম্ভাবনা, এত সম্পদ নিয়ে গড়ে তোলা গবেষণাগারগুলি কেন এমন লক্ষ্যহীন অসফল প্রয়াসে পরিণত হয়? অনেক উৎসাহ নিয়ে শুরু করা প্রকল্পগুলি কেন মাঝপথে থেই হারিয়ে বদ্ধ জলাশয়ের মত অস্তিত্ব বজায় রাখে? কেন শিক্ষিত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিজ্ঞানকর্মীরা নিরুৎসাহ হয়ে মামুলি কাজকর্মের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষায় তৎপর হন? অভিজ্ঞতায় দেখেছি গবেষণাগারগুলি শেষ পর্যন্ত স্বার্থ ও ক্ষমতার গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয় আর নানা টানা পোড়েনের খেলা চলতে থাকে। বিজ্ঞান গবেষণার চেয়ে ব্যক্তিগত আনুগত্য, ক্ষমতার যুদ্ধে কৌশলী হওয়া, ইত্যাদি জিনিষগুলি প্রধান হয়ে উঠে সাধারণ কর্মীরা এই খেলাতে অসহায় দর্শকের মত এদিক ওদিক দুলতে দুলতে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। বিজ্ঞান গবেষণার জন্য যে ম্যানেজমেণ্ট তার মধ্য থেকেই এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সরকারী শিল্পের গবেষণাগারগুলিতে এই ম্যানেজমেণ্ট নানা ধাপের মধ্য দিয়ে কিভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলিতে গিয়ে পৌছায়, নানা স্তরের মধ্য দিয়ে কিভাবে বিজ্ঞান পরিচালনার নীতি গৃহীত হয়, কিভাবেই বা তা পরিবর্তিত হয় অথবা নতুন মোড় নেয় তা জানি না, কিন্তু যে নীতিগুলি এসে পৌছায় এবং তার যেভাবে রূপায়ণ হয় তা থেকে এই ম্যানেজমেণ্টের মানসিকতা অনুমান করা যায়।

কার্যকরী গবেষণার জন্য নানা বিভাগের ও নানা স্তরের যে নিবিড় যোগাযোগের প্রয়োজন হয় তার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যও স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের একটি ব্যাপক সংযোগের প্রয়োজন আছে মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞান পরিচালনার জন্য যে ম্যানেজমেণ্ট তাঁরাই শাসনের কর্তা ও ক্ষমতার স্তম্ভ। তাই তাঁদের সঙ্গে বিজ্ঞানকর্মীর ব্যবধান বিরাট। আমাদের দেশে শাসনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এরা হলেন সর্ববিদ্যাবিশারদ, সব সমস্যার সমাধানকারী (?) কতিপয় ব্যক্তি যাঁদের চিন্তার হদিশ নীচের স্তরের কর্মীদের মধ্যে পৌছায় না। ফলে গবেষক কর্মীরা যে সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য নিয়োজিত হন তার বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে অবহিত হন না, তেমনি আবার এর সীমানা ও পরিণতি সম্বন্ধেও সচেতন থাকেন না। বিজ্ঞান গবেষণা সম্বন্ধে যেহেতু আমাদের দেশে এখন সামাজিক চেতনা খুবই কম, সামাজিক প্রয়োজন যেহেতু এই নীতির প্রণয়নে একটি নির্দিষ্ট শক্তি হয়ে উঠতে পারে নি তাই এই নীতির প্রবক্তা হয়ে ওঠেন কতিপয় 'বুদ্ধিমান ব্যক্তি'। আমাদের দেশে যেখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে গভীর ত্রুটি বর্তমান, যেখানে শিল্প বিজ্ঞান ও কারিগরি বিকাশের গভীর কোন ট্র্যাডিশন গড়ে ওঠেনি সেখানে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার প্রসার ঘটিয়ে ও বিজ্ঞান কর্মীদের সক্রিয় ও উৎসাহী করে তুলে এক দীর্ঘস্থায়ী ফললাভের পরিকল্পনার বদলে তাঁরা গবেষণাগারগুলিকে এক একটি আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। ধাপে ধাপে আত্মনির্ভর বিকাশের পরিবর্তে উন্নত দেশগুলির কলাকৌশলের ঔজ্জ্বল্যে এঁদের মন আচ্ছন্ন থাকে। সেই কলাকৌশলের ফাঁদে এদেশের গবেষণাগারের আশু ফলাফল যেহেতু একেবারেই অনাকর্ষনীয়, ম্যানেজমেণ্ট তাই এগুলির উপর কোন আস্থা না রেখে দুর্লভ মূল্যে হলেও আন্তর্জাতিক বাজারে যা পেতে অসুবিধা হয় না সেই সমস্ত চমকপ্রদ টেকনোলজী কিনে ম্যানেজ করার সাফল্য অর্জন করেন। অন্যদিকে বহু লক্ষ টাকার দামী দামী যন্ত্রপাতি এবং বহু উপাধি সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে সজ্জিত ল্যাবরেটরীগুলি তাঁদের ক্ষমতার খেলার খেলনা হয়ে উঠে।

প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুগুলিতে যখন এই অবস্থা তখন প্রশ্ন হল কাঠামোর কিছু পরিবর্তন করে কোন উন্নতি আনা সম্ভব হবে কি? CSIR-এর পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাবকে এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করি।

নি. ম.
কলিকাতা

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে অভিজিৎ লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্পাদক হিরন্ময় সাহা কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেস, ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ্ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।